পরিক্রমা

শক্তির মুক্তি

যুগের স্রোতে জাগরণের টান। শ্রীরামকৃষ্ণের ১৮৪ তম জন্মজয়ন্তী অতিক্রান্ত। স্বামীজী ১৮৯৩ সালে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রবর্তিত এক নতুন মতাদর্শ। চিন্তাজগতে বেদান্তের মর্মকথা, ধর্মীয় মতামতের এক অপূর্ব উদার সমাধান। কালের তরঙ্গ সেই সত্যকে বহন করে আধুনিক মানুষের চিন্তাজগতে পৌঁছে দিয়েছে। সূর্যের উদয়সমারোহ দেখতে হলে আঁধার রাতে বহুক্ষণ প্রতীক্ষা করতে হয়। তিনি এসেছেন, রুদ্ধ দুয়ার উন্মুক্ত করেছেন—সত্যসূর্যের রাঙা আলো-ঝলমল দিগন্তে ধীরে ধীরে অরুণোদয় ঘোষণা করেছে নতুন যুগ। তবু দিশাহারা উদ্‌ভ্রান্ত মন 'ন যযৌ ন তস্থৌ' হয়ে আরও অনেক সময় নিয়েছে। যখন নবীন বীণার ঝংকারে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত, পাখির কলকাকলিতে পূর্ণ প্রকৃতি, সোনাঝরা আলোর দ্যুতি আকাশ জুড়ে, ধরণী সবুজ আঁচলে অঙ্গ ঢেকেছে, তবু সংবিৎ ফেরেনি। এখনও হিংস্র কুটিল চাহনি মানুষেরই চোখে। সে জানে শুধু স্বার্থ, সে চায় ক্ষমতা ও সম্পদ। মানুষ আজ মানুষের শত্রু। এতদিনে বোধহয় নতুন করে ভাবার ও জীবন তৈরি করার প্রেরণা এল। একদিকে আকণ্ঠ ভোগের তাড়না, অন্যদিকে শাশ্বত চিরন্তন অমৃতের সন্ধান। সে-অমৃতের সন্ধান দিয়েছিলেন বৈদিকযুগের ঋষিকুল। এবার অখণ্ডের ঘর থেকে অমৃতভাণ্ড নিয়ে বিশ্বে নামলেন বিবেকসূর্য বিবেকানন্দ। বৈশাখে মার্তণ্ডের যেমন প্রখর কিরণ, তেমনি বৈশাখী ঝড়। এ-মাস মধুমাস নয়। অথচ ভগবান বুদ্ধ, আচার্য শংকর উভয়েই এ-ধরিত্রীর কোলে আবির্ভূত হয়েছিলেন বৈশাখে। দুই অবতারের আগমনে একদিকে ন্যায়-নীতি-জ্ঞান এবং পরিবর্তনের অদ্ভুত ঝড়। এই ভারতকে ওলট-পালট করেছিলেন মহামানব বুদ্ধ, মহাসন্ন্যাসী শংকর।

তাঁদের সময়ে সমাজ, মানুষ ছিল অরণ্যপ্রকৃতিতে বেষ্টিত। নদী-নির্ঝর, পর্বত অরণ্য, পশুকুল, বিহঙ্গম সবই আঁকা ছিল চালচিত্রে। ছিল পুরনো ভারতের স্নিগ্ধ, সজল প্রশান্তি। ভগবান বুদ্ধকে ঘিরে রচিত হয়েছিল বৌদ্ধযুগ—বেদবিরোধী বিপ্লব কিন্তু নীতির ওপর মনুষ্যত্বের সৌধরচনা। আচার্য শংকরের ধর্মভাবনা অভিষ্ণাত ছিল সনাতন ভারতবর্ষের ঐতিহ্যের ধারায়।

স্বামীজী এসেছিলেন এক গৌরবহারা বিধ্বস্ত ভারতে। মনুষ্যত্বের মর্যাদাহীন পশুতুল্য দরিদ্র জনগণে পূর্ণ এক কুসংস্কারাচ্ছন্ন পরিবেশে। কলকাতা মহানগরীর ইংরেজি শিক্ষাকে, ভাষাকে তিনি গ্রহণ নয়, সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব করেছিলেন, কোনও এক মিশন সিদ্ধ করার জন্য—যার সম্বন্ধে তখন তিনি সচেতন ছিলেন না। মানুষের জয়গানই ছিল তাঁর ধর্মের মর্মকথা। শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ জীবন ও ভারতের সনাতন শাস্ত্র ছিল তাঁর অস্ত্র। বর্ম ছিল অদ্ভুত চরিত্রবল। কত কথাই তো জেনে না জেনে আমরা ভেবেছি। তিনি গিয়েছিলেন দরিদ্র ভারতের জন্য অর্থসংগ্রহ করতে, ভারতের অধ্যাত্মজ্ঞান বিতরণে পশ্চিমি সভ্যতাকে সচেতন করতে। ভেবেছিলেন বিনিময়ে ওদের থেকে নতুন ভারত সংগ্রহ করবে রজোগুণের সম্ভার, ঐহিক জীবনে উন্নতির কলাকৌশল। কিন্তু তাদের কাছে কিছু গ্রহণের পরিবর্তে তিনি প্রথমেই আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিতরণে ভরিয়ে দিলেন সেখানকার

নরনারীকে। তিরিশ বছরের যুবার দৈব বাগ্মিতায় নিমেষে ম্লান হল ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যের জৌলুস। ভারতের জ্ঞানসূর্য উজ্জ্বলতর মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হল। বহু বাধাবিঘ্ন বিরোধিতা সংকীর্ণতা তখনই জেগেছিল অসংস্কৃত মলিন মনে, কিন্তু সে-মহাশক্তির তরঙ্গে খড়কুটোর মতো ভেসে গেল বহু অনুদার স্পর্ধিত অহংকার। সাময়িকভাবে স্তম্ভিত হয়েছিল বিদেশের শিক্ষিতসমাজ। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকে কিন্তু ভারতের মানুষ অনেক সহজে পেয়েছিল, সেযুগের বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের তকমাহীন পরমহংসদেবকে স্বীকার করতে দ্বিধা করেনি উনিশ শতকের শিক্ষিত ও পরিশীলিত মানুষ। অপরদিকে বলা যায়, শিক্ষার উদার আলো আমেরিকার নরনারীদেরও মানসিক গ্রহিষ্ণুতা এনেছিল নইলে স্বামীজীর উদার ভাবনায় কী করে অবগাহন করেছিল বিপুল সংখ্যক বিজ্ঞানঋদ্ধ মানুষজন?

স্বামীজীর মাত্র পাঁচ মিনিটের ভাষণ সেদেশের মানুষের মনের অনেক বদ্ধ দরজা উন্মুক্ত করেছিল। ইংল্যান্ডে তিনি মায়ার কথা, মানুষের যথার্থ স্বরূপের কথা বলেছিলেন। উপনিষদ এবং নিজের ধর্মীয় বিপুল অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি দিয়ে আমেরিকার বুদ্ধিজীবীদের সামনে তুলে ধরেছিলেন ধর্মের মর্মকথা। তাঁর সেই জ্ঞানের তীব্র প্রবাহের মধ্যে যাঁরা পড়েছিলেন তাঁরা এক অজ্ঞাত শক্তির স্ফুরণে রূপান্তরিত হয়েছিলেন, যা বহুযুগের আন্তর সংগ্রামের ফসল। সে-ভাব ধরে রাখা সুকঠিন। বহু মানুষই সে-ভাব ধরে রাখতে পারেননি।

স্বামীজী আমেরিকায় রজোগুণের মহাবিকাশ দেখেও নিবৃত্ত হননি। জাগতিক উন্নতিলাভের প্রয়াসকে তিনি কখনও অবহেলা করেননি। তাই নির্দ্বিধায় বেদান্তের উচ্চ অধ্যাত্মভাবের বীজ ছড়িয়েছিলেন। কর্মে উত্তাল সেই দেশেও তিনি দেখেছিলেন নরনারীর অন্তরে সেই অব্যক্ত ব্রহ্মশক্তির বিলাস। প্রকাশোন্মুখ মানবাত্মার বিচিত্র পরিণতি। সেই মহাশক্তির পশ্চাৎপটে ছিলেন তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি মাতৃরূপে পরমা শক্তিকে আবাহন করেছিলেন। স্বামীজীর মনে হয়েছিল যে-শক্তির সূচনামাত্র জগতে এবং সমষ্টি মনোজগতে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে তার পরিণতি কী বিপুল হতে পারে! আমেরিকায় তিনি মাতৃশক্তির নবীন বিকাশ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। শিক্ষার আলোক ও সামাজিক স্বাধীনতা যে কী অভাবনীয় উন্নতি নিয়ে আসে তা চাক্ষুষ করে বুঝেছিলেন, ভারতীয় মেয়েদের অতিশুদ্ধ মাতৃভাবের পরম্পরা যদি ওই কর্মতৎপরতা, আত্মবিশ্বাস ও ধীশক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়—তবে ভারতীয় নারীজীবনে আলোড়নকারী প্রবল শক্তির উৎস খুলে যাবে এবং পুরনো মহিমাকে অতিক্রম করে নারীর আলোকবর্ষী জয়যাত্রা ত্বরান্বিত হবে।

ভারত চিরকালই শক্তির পূজা করেছে তার নিজের ভাবে। আজও বিভিন্ন প্রদেশে পুণ্য নবরাত্রিতে দেবীর নয়টি বিগ্রহে পূজা অথবা দেবীমাহাত্ম্য শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, সপ্তশতী হোম—কত ভাবেই তাঁর পূজা-উপাসনা, জপ-প্রার্থনা চলে আসছে। কিন্তু স্বামীজী দেখেছিলেন জ্যান্ত জগদম্বা ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠিত। তাঁরা সংসারের সব নিয়ন্ত্রণ করেন অথচ শিক্ষার অভাবে, পুষ্টি ও সহানুভূতির অভাবে আজও, এই একবিংশ শতাব্দীতেও নারীর কত অবমাননা! শক্তি কেমন করে জেগে উঠবে সে-প্রশ্ন আজ অবান্তর। শ্রীরামকৃষ্ণদেব জাতির সমষ্টি কুলকুণ্ডলিনীকে স্বয়ং জাগ্রত করে, এযুগের ছেলেমেয়েদের দায়িত্ব শ্রীমা সারদা দেবীর পদ্মহস্তে সমর্পণ করেছিলেন। সে-মহাশক্তি আজকের নারীদের মধ্যে ধীরে ধীরে জাগ্রত হচ্ছে। না, নারীর অবমাননা এযুগ সহ্য করবে না। আসুন আমরা প্রার্থনা করি—মহাশক্তি, মাতৃরূপিণী অতি পবিত্র শক্তি আমাদের সত্তায় জাগ্রত হোন।